গীবত
এক ঘৃণিত অপরাধ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

গীবত
এক ঘৃণিত অপরাধ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.

সংকলন ও সম্পাদনা

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সংকলন ও সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 984-645-030-6
শ. প্র : ০৮

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১৭৪১০, মোবাইল : ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

প্রকাশকাল
প্রথম মুদ্রণ : ১৯৯৮ ঈসায়ী
ষষ্ঠ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৪ ঈসায়ী

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ১৬.০০ টাকা মাত্র

GIBOT AK GHRINITO OPORAD, By Sayyed Abul A'la Maudoodi, Compiled and Edited by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8317410, Mob: 01753422296 E-mail: shotabdipro@yahoo.com. First Edition : 1998, 6th Print : April 2014.

Price Tk. 16.00 Only.

আমাদের কথা

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন মজীদে গীবতকে এক চরম ঘৃণিত অপরাধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। গীবত ইসলামী সমাজ ও সংগঠনের জন্য এমন এক মারাত্মক ব্যাধি, যা কেবল বিরাগ-বিভাজন আর ধ্বংসই টেনে আনে। এ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়লে যে কোনো সংগঠন বা সমাজ তার প্রাণ-চাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। সেখানে গড়ার কাজের পরিবর্তে ভাংগনের কাজই ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তাই, সাংগঠনিক ও সামাজিকভাবে মুমিনদের মুক্ত থাকা চাই এই ঘৃণিত ব্যাধি থেকে।

মাওলানা মওদূদী র. তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে গীবত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তুলে ধরেছেন এর বীভৎস রূপ। আমরা এখানে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকা গীবত সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা সংকলন করেছি। যারা গীবতের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে চান এবং বাঁচাতে চান অন্যদেরও এই পুস্তিকাটি তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আবদুস শহীদ নাসিম

১৫. ৯. ১৯৯৮ ইং

সূচিপত্র

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ধারণা দোষান্বেষণ ও গীবত

কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ . اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا . اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ .

"হে ঈমানদার লোকেরা! বেশি ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ কোনো কোনো ধারণা অনুমান পাপ। আর দোষ অন্বেষণ করোনা। এবং তোমাদের কেউ যেনো কারো গীবত না করে। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ্‌ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

এ আয়াতে তিনটি কাজ নিষেধ করা হয়েছে। সেগুলো হলো ঃ

১. বেশি বেশি ধারণা অনুমান করা।

২. অপরের দোষ খুঁজে বেড়ানো।

৩. গীবত করা।

এ পুস্তকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ গীবত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হবে।

বেশি বেশি ধারণা অনুমান করা নিষেধ

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে ঈমানদার লোকেরা বেশি ধারণা অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ কোনো কোনো ধারণা- অনুমান পাপ। (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

এখানে একেবারেই ধারণা করতে নিষেধ করা হয়নি। বরং খুব বেশি ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে এবং সব রকম ধারণার অনুসরণ থেকে মানা করা হয়েছে। এর কারণ বলা হয়েছে এই যে, অনেক ধারণা গুনাহের পর্যায়ে পড়ে। এ নির্দেশটি বুঝার জন্য আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত, ধারণা কত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের নৈতিক অবস্থা কি?

এক প্রকারের ধারণা হলো সেটা, যা নৈতিকতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পসন্দনীয় এবং দীনের দৃষ্টিতেও কাম্য ও প্রশংসিত। যেমন ঃ আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করা। তাছাড়া যাদের সাথে ব্যক্তিগত মেলামেশা ও উঠাবসা আছে এবং যাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণের কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই।

আরেক প্রকারে ধারণা আছে যা করা ছাড়া বাস্তব জীবনে চলার কোনো উপায় নেই। যেমন, আদালতে বিচারকের সামনে যেসব সাক্ষ পেশ করা হয় তা যাঁচাই বাছাই করে নিশ্চিত প্রায় ধারণার ভিত্তিতে ফায়সালা করা ছাড়া আদালত চলতে পারেনা। কারণ, বিচারকের পক্ষে ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। আর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নিশ্চিত সত্য হয়না, বরং প্রায় নিশ্চিত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ক্ষেত্রে কোনো না কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে, কিন্তু বাস্তব জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া মানুষের জন্য আর কোনো উপায় থাকেনা।

তৃতীয় এক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলত খারাপ ধারণা হলেও বৈধ প্রকৃতির। এ প্রকারের ধারণা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যেমন ঃ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চরিত্র ও কাজ-কর্মে কিংবা তার দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও চালচলনে এমন সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে ওঠে যার ভিত্তিতে সে আর ভাল ধারণার যোগ্য থাকে না, বরং তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণের একাধিক যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান। এরূপ পরিস্থিতিতে শরীয়ত কখনো এ দাবী করে না যে, সরলতা দেখিয়ে মানুষ তার প্রতি অবশ্যই ভাল ধারণা পোষণ করবে। তবে এ বৈধ খারাপ ধারণা পোষণের চূড়ান্ত সীমা হচ্ছে তার সম্ভাব্য দুস্কৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিছক ধারণার ভিত্তিতে আরো অগ্রসর হয়ে তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া ঠিক নয়।

চতুর্থ আরেক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলত পাপ। সেটি হচ্ছে, বিনা কারণে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা, কিংবা অন্যদের ব্যাপারে মতস্থির করার বেলায় সবসময় খারাপ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই শুরু করা, কিংবা এমন লোকদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা

পোষণ করা যাদের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সৎ ও শিষ্ট হওয়ার প্রমাণ দেয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তির কোনো কথা বা কাজে যদি ভাল ও মন্দের সমান সম্ভাবনা থাকে কিন্তু খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যদি সেটাকে খারাপ হিসেবেই ধরে নেই তাহলে তা গুনাহের কাজ বলে গণ্য হবে। যেমন ঃ কোনো সৎ ও ভদ্র লোক কোনো বৈঠক থেকে উঠে যাওয়ার সময় নিজের জুতার পরিবর্তে অন্য কারো জুতা উঠিয়ে নিলেন। এখন আমরা যদি ধরে নেই যে, জুতা চুরি করার উদ্দেশ্যেই তিনি এ কাজ করেছেন, অথচ এ কাজটি ভুল বশত ও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ভালো সম্ভাবনার দিকটি বাদ দিয়ে খারাপ সম্ভাবনার দিকটি গ্রহণ করার কারণ খারাপ ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ বিশ্লেষণ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, ধারণা করা কোনো নিষিদ্ধ বিষয় নয়। বরং কোনো কোনো পরিস্থিতিতে তা পছন্দনীয়, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জায়েয। কিন্তু ঐ সীমার বাইরে নাজায়েয এবং কোনো কোনো পরিস্থিতিতে একেবারেই নাজায়েয। তাই এ কথা বলা হয়নি যে, ধারণা বা খারাপ ধারণা করা থেকে একদম বিরত থাকো। বরং বলা হয়েছে, অধিক মাত্রায় ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। তাছাড়া নির্দেশটির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করার জন্য আরো বলা হয়েছে, কোনো কোনো ধারণা পাপ। এ সতর্কীকরণ দ্বারা আপনা থেকেই বুঝা যায়, যখনই কোনো ব্যক্তি ধারণার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাবে কিংবা কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখন তার ভালভাবে যাচাই বাছাই করে দেখা দরকার, যে ধারণা সে পোষণ করছে তা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয় তো? আসলেই কি এরূপ ধারণা পোষণের দরকার আছে? এরূপ ধারণা পোষণের জন্য তার কাছে যুক্তিসংগত কারণ আছে কি? ঐ ধারণার ভিত্তিতে সে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করছে তা কি বৈধ? যেসব ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, এতটুকু সাবধানতা তারা অবশ্যই অবলম্বন করবে। লাগামহীন ধারণা পোষণ কেবল তাদেরই কাজ যারা আল্লাহর ভয় থেকে মুক্ত এবং আখেরাতের জবাবদিহি সম্পর্কে উদাসীন।

মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ানো নিষেধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তোমরা দোষ খুঁজে বেড়িওনা।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন, মানুষের গোপন বিষয় তালাশ করোনা। একজন আরেকজনের দোষ খুঁজে বেড়িওনা। অন্যদের অবস্থা ও ব্যাপার স্যাপার অনুসন্ধান করে বেড়াবে না। এ আচরণ খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হোক কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য করা হোক অথবা শুধু নিজের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য, শরীয়তের দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায় তা নিষিদ্ধ। অন্যদের যেসব বিষয় লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে তা খোঁজাখুঁজি করা এবং কার কি দোষ-ত্রুটি আছে ও কার কি কি দুর্বলতা গোপন আছে পর্দার অন্তরালে উঁকি দিয়ে তা জানার চেষ্টা করা কোনো মু'মিনের কাজ নয়। মানুষের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দু'জনের কথোপকথন কান পেতে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরে উঁকি দেয়া এবং বিভিন্ন পন্থায় অন্যদের পারিবারিক জীবন কিংবা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি খোঁজ করে বেড়ানো একটা বড় অনৈতিক কাজ। এর দ্বারা নানা রকম বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এ কারণে একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খোতবায় দোষ অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"হে সেই সব লোকজন, যারা মুখে ঈমান এনেছো কিন্তু ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়াবে আল্লাহু তার দোষ-ত্রুটির অন্বেষণে লেগে যাবেন। আর আল্লাহ যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার ঘরের মধ্যে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।" (আবু দাউদ)

হযরত মুয়াবিয়া রা. বলেন ঃ আমি নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

"তুমি যদি মানুষের গোপনীয় বিষয় জানার জন্য তাদের পেছনে লাগো, তাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং অন্তত বিপর্যয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেবে।" (আবু দাউদ)

"তোমাদের মনে কারো সম্পর্কে সন্দেহ হলে, অন্বেষণ করোনা।" (আহকামুল কুরআন- জাস্‌সাস)

অপর একটি হাদীসে নবী করীম সা. বলেছেন ঃ

"কেউ যদি কারো গোপন দোষ-ত্রুটি দেখে ফেলে এবং তা গোপন রাখে তাহলে সে যেনো একজন জীবন্ত পুঁতে ফেলা মেয়ে সন্তানকে জীবন দান করলো।" (আল জাস্‌সাস)

দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার এ নির্দেশ শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং সরকারের জন্যেও প্রযোজ্য। ইসলামী শরীয়ত নাহী আনিল মুনকারের (মন্দ কাজ প্রতিরোধের) যে

দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছে তার দাবী এ নয় যে, সে একটি গোয়েন্দা চক্র কায়েম করে মানুষের গোপন দোষ-ক্রটিসমূহ খুঁজে খুঁজে বের করবে এবং তাদের শাস্তি প্রদান করবে। বরং যেসব অসৎ প্রবণতা ও দোষ-ক্রটি প্রকাশ হয়ে পড়বে কেবল তার বিরুদ্ধেই তার শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। গোপনীয় দোষ-ক্রটি ও খারাপ চালচলন সংশোধনের উপায় গোয়েন্দাগিরি নয়। বরং শিক্ষা, উপদেশ-নসীহত, জনসাধারণের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ এবং একটি পবিত্র সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করাই তার একমাত্র উপায়। এ ক্ষেত্রে হযরত উমর রা.-এর এ ঘটনা অতীব শিক্ষাপ্রদ। একবার রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইতে ছিল। তাঁর সন্দেহ হলো। তিনি প্রাচীর টপকে উঠে দেখলেন, সেখানে শরাব প্রস্তুত, তার সাথে এক নারীও। তিনি চিৎকার করে বললেন ঃ ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই কি মনে করেছিস, তুই আল্লাহর নাফরমানী করবি আর তিনি তোর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবেন না? জবাবে সে বললো ঃ আমীরুল মু'মিনীন, তাড়াহুড়ো করবেন না। আমি যদি একটি গুনাহ করে থাকি তবে আপনি তিনটি গোনাহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা দোষ-ক্রটি খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনি দোষ-ক্রটি খুঁজেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো। কিন্তু আপনি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ঘর ছাড়া অনুমিত না নিয়ে অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া আপনি আমার ঘরে পদার্পণ করেছেন।" এ জবাব শুনে হযরত উমর রা. নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন না। তবে তিনি তার কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে কল্যাণ ও সুকৃতির পথ অনুসরণ করবে। (মাকারিমুল আখলাক-আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর আল খারায়েতী)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুঁজে খুঁজে মানুষের গোপন দোষ-ক্রটি বের করা এবং তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যও জায়েয নয়। একটি হাদীসেও একথা উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী করীম সা. বলেছেন ঃ

"শাসকরা যখন সন্দেহের বশে মানুষের দোষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে, তখন তারা তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়।" (আবু দাউদ)

হ্যাঁ, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি খোঁজ-খবর নেয়া ও অনুসন্ধান করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবে সেটা এ নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়। যেমন ঃ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণে বিদ্রোহের কিছুটা লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে তারা কোনো অপরাধ সংঘটিত করতে যাচ্ছে বলে আশংকা সৃষ্টি হলে সরকার তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে পারে। অথবা কোনো ব্যক্তিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় বা তার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে চায় তাহলে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য সে তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে এবং খোঁজ-খবর নিতে পারে।

গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ

আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে অকাট্যভাবে বলে দিয়েছেন ঃ "এবং তোমাদের কেউ যেনো অপর কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে নিজের মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখো, তা কিন্তু তোমরা ঘৃণা করো। আল্লাহকে ভয় করো। অবশ্যি আল্লাহ্ অধিক অধিক তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

গীবতের সংজ্ঞা

গীবতের সংজ্ঞা হলো ঃ "কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।" স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গীবতের এ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং আরো অনেক হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ঐ হাদীসে নবী করীম সা. গীবতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তা হলো ঃ

ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَه .قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِى اَخِيْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ
اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَه وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّه.

"গীবত হচ্ছে এই যে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বললে যা তার কাছে অপছন্দনীয়। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার মত কি? তিনি বললেন ঃ তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে তো অপবাদ আরোপ করলে।"

ইমাম মালেক র. তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এ বিষয়ে আর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَاالْغِيْبَةُ ؟
فَقَالَ اَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَه اَنْ يَّسْمَعَ - فَقَالَ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ وَاِنْ كَانَ حَقٌّ ؟ قَالَ اِذَا قُلْتَ بَاطِلاً فَذَالِكَ الْبُهْتَانُ-

"এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, গীবত কাকে বলে? তিনি বললেন ঃ কারো সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা তার পছন্দ নয়। সে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, যদি আমার কথা সত্য হয়? তিনি জবাব দিলেন ঃ তোমার কথা মিথ্যা হলে তো সেটা অপবাদ।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব বাণী থেকে প্রমাণিত হয়, কারো বিরুদ্ধে তার অনুপস্থিতিতে মিথ্যা অভিযোগ করাই অপবাদ আর তার সত্যিকার দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা গীবত। এ কাজ স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে করা হোক বা ইশারা ইংগিতের মাধ্যমে করা হোক সর্বাবস্থায় তা হারাম। অনুরূপভাবে এ কাজ ব্যক্তির জীবদ্দশায় করা হোক বা মৃত্যুর পরে করা হোক উভয় অবস্থায় তা সমানভাবে হারাম। আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মায়েয ইবনে মালেক আসলামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধে 'রজম' করার শাস্তি কার্যকর করার পর নবী সা. পথ চলতে চলতে শুনলেন, এক ব্যক্তি তার সংগীকে বলছে ঃ এ লোকটার ব্যাপারটাই দেখো, আল্লাহ তার অপরাধ আড়াল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না তাকে কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি তার পিছু ছাড়েনি। সামনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটি গাধার গলিত মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হলো। নবী করীম সা. সেখানে থেমে গেলেন এবং ঐ দু'ব্যক্তিকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা দু'জন ওখানে গিয়ে গাধার ঐ গলিত মৃত দেহটা আহার করো।" তারা দু'জনে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, কেউ কি তা খেতে পারে? নবী সা. বললেন ঃ

"তোমরা এইমাত্র তোমাদের ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদার ওপর যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলে তা গাধার এ মৃতদেহ খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি নোংরা কাজ।"

ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র

যেসব ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বা তার মৃত্যুর পর তার মন্দ দিকগুলো বর্ণনা করার এমন কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক এবং গীবত ছাড়া ঐ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না, তাছাড়া ঐ প্রয়োজন পূরণের জন্য গীবত না করা হলে তার চেয়েও অধিক মন্দ কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এমন ক্ষেত্রসমূহ গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তরভুক্ত নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যতিক্রমকে মূলনীতি হিসেবে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"কোন মুসলমানের মান-মর্যাদার ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা জঘন্যতম জুলুম।"

এ বাণীতে "অন্যায়ভাবে" কথাটি বলে শর্তযুক্ত করাতে বুঝা যায়, ন্যায়ভাবে এরূপ করা জায়েয। নবী সা.-এর নিজের কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন কয়েকটি নজীর দেখতে পাই যা থেকে জানা যায়, ন্যায়ভাবে বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং কি রকম পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে গীবত করা জায়েয হতে পারে।

একবার এক বেদুঈন এসে নবী সা.-এর পিছনে নামাযে শামিল হলো এবং নামায শেষ হওয়া মাত্রই একথা বলে প্রস্থান করলো যে, হে আল্লাহ! আমার ওপর রহম করো এবং

মুহাম্মদের ওপর রহম করো। আমাদের দু'জন ছাড়া আর কাউকে এ রহমতের মধ্যে শরীক করো না। তখন নবী করীম সা. সাহাবীদের বললেন ঃ

"তোমরা কি বলো, এ লোকটাই বেশী বেকুফ, না তার উট? তোমরা কি শুননি সে কি বলছিলো?" (আবু দাউদ)

নবী সা.কে তার অনুপস্থিতিতেই একথা বলেছেন। কারণ সালাম ফেরানো মাত্রই সে চলে গিয়েছিল। নবীর উপস্থিতিতেই সে একটি ভুল কথা বলে ফেলেছিল। তাই এ ব্যাপারে তাঁর নিশ্চুপ থাকা কাউকে এ ভ্রান্তিতে ফেলতে পারতো যে, সময় বিশেষে এরূপ কথা বলা হয়তো জায়েয। তাই নবী সা. কর্তৃক একথার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়ে পড়েছিলো।

ফাতেমা বিনতে কায়েস রা. নামক এক মহিলাকে দু' ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দেন। একজন হযরত মুয়াবিয়া রা. অপরজন আবুল জাহম রা.। ফাতেমা বিনতে কায়েস নবী সা.কে কাছে এসে পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন ঃ মুয়াবিয়া গরীব আর আবুল জাহম স্ত্রীদের বেদম প্রহার করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম) এখানে একজন নারীর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রশ্ন জড়িত ছিল। সে নবী সা.কে কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছিল। এমতাবস্থায় উভয় ব্যক্তির যে দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি তাঁর জানা ছিল তা তাকে জানিয়ে দেয়া তিনি জরুরী মনে করেন।

একদিন নবী সা. হযরত আয়েশার রা. ঘরে ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি তার গোত্রের মধ্যে অত্যন্ত খারাপ লোক। এরপর তিনি বাইরে গেলেন এবং তার সাথে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে কথাবার্তা বললেন। নবী সা. ঘরে ফিরে এলে হযরত আয়েশা রা. বললেন ঃ আপনি তো তার সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বললেন। অথচ যাওয়ার সময় আপনি তার সম্পর্কে ঐ কথা বলেছিলেন। জবাবে নবী সা. বললেন ঃ

"যে ব্যক্তির কটু বাক্যের ভয়ে লোকজন তার সাথে উঠাবসা পরিত্যাগ করে, কিয়ামতের দিন সে হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে জঘন্যতম ব্যক্তি।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ ঘটনা সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও নবী সা. তার সাথে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলেছেন এ জন্য যে, নবী সা.-এর উত্তম স্বভাব এটিই দাবী করে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি আশংকা করলেন ঃ লোকটির সাথে তাঁকে দয়া ও সৌজন্য প্রকাশ করতে দেখে তার পরিবারের লোকজন তাকে তাঁর বন্ধু বলে মনে করে বসতে পারে। তাহলে পরে কোনো সময় সে এর সুযোগ নিয়ে কোনো অবৈধ সুবিধা অর্জন করতে পারে। তাই তিনি হযরত আয়েশাকে সতর্ক করে দিলেন যে, সে তার গোত্রের জঘন্যতম মানুষ।

এক সময় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এসে নবী সা.কে বললো, "আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট

হতে পারে এমন অর্থকড়ি সে দেয় না।" (বুখারী ও মুসলিম) স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর এ ধরনের অভিযোগ যদিও গীবতের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু নবী সা. তা বৈধ করে দিয়েছেন। কারণ জুলুমের প্রতিকার করতে পারে এমন ব্যক্তির কাছে জুলুমের অভিযোগ নিয়ে যাওয়ার অধিকার মজলুমের আছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের এসব দৃষ্টান্তের আলোকে ফকীহ ও হাদীস বিশারদগণ এ বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, গীবত কেবল তখনই বৈধ, যখন সংগত (অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে সংগত) কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং ঐ প্রয়োজন গীবত ছাড়া পূরণ হতে পারে না। সুতরাং এ বিধির ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ নিম্নরূপ গীবতকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন ঃ

এক ঃ যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিকারের জন্য কিছু করতে পারে বলে আশা করা যায়, এমন ব্যক্তির কাছে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের ফরিয়াদ।

দুই ঃ সংশোধনের উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তিদের কাছে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্মের কথা বলা, যারা তার প্রতিকার করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

তিন ঃ ফতোয়া চাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো মুফতির কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার সময় যদি কোনো ব্যক্তির ভ্রান্ত কাজ-কর্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।

চার ঃ মানুষকে কোনো বক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অপকর্মের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান করে দেয়া। যেমন ঃ হাদীস বর্ণনাকারী, সাক্ষী এবং গ্রন্থ প্রণেতাদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করা সর্বসম্মত মতে শুধু জায়েযই নয়, বরং ওয়াজিব। কেননা, এ ছাড়া শরীয়তকে ভুল রেওয়ায়াতের প্রচারণা ও বিস্তার থেকে আদালতসমূহকে বেইনসাফী থেকে এবং জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদেরকে গোমরাহী থেকে, রক্ষা করা সম্ভব নয়। অথবা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো ব্যক্তি কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী কিংবা কারো বাড়ীর পাশে বাড়ী খরিদ করতে চায়, অথবা কারো সাথে অংশীদারী কারবার করতে চায়, অথবা কারো কাছে আমানত রাখতে চায়, এমন ব্যক্তি আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে তাকে সে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবহিত করা আপনার জন্য ওয়াজিব, যাতে না জানার কারণে সে প্রতারিত না হয়।

পাঁচ ঃ যেসব লোক পাপকাজের বিস্তার ঘটাচ্ছে অথবা বিদআত ও গোমরাহীর প্রচার চালাচ্ছে অথবা আল্লাহর বান্দাদেরকে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ও জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সোচ্চার হওয়া এবং তাদের দুষ্কর্ম ও অপকীর্তির সমালোচনা করা।

ছয় ঃ যেসব লোক কোনো মন্দ নাম বা উপাধিতে এতই বিখ্যাত হয়েছে যে, ঐ নাম ও উপাধি ছাড়া অন্য কোনো নাম বা উপাধি দ্বারা তাদের আর চেনা যায় না, তাদের মর্যাদাহানির উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিচয় দানের জন্য ঐ নাম ও উপাধি ব্যবহার করা।*

---

* (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ফাতহুল বারী, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬২; শরহে মুসলিম-নববী, বাব ঃ তাহরীমুল গীবাত। রিয়াদুস সালেহীন, বাব ঃ মা ইউবাহু মিনাল গীবাত। আহ্‌কামুল কুরআন-জাস্‌সাস। রুহুল মা'আনী-লা ইয়াগতাব বাদুকুম বাদান-আয়াতের তাফসীর)।

নিন্দা ও গীবতের প্রতিবাদ করতে হবে

এ ব্যতিক্রম ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অসাক্ষাতে কারো নিন্দা করা একেবারেই হারাম। এ নিন্দা সত্য ও বাস্তব ভিত্তিক হলে তা গীবত, মিথ্যা হলে অপবাদ এবং দু'জনের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হলে চোখলখুরী। ইসলামী শরীয়ত এ তিনটি জিনিসকেই হারাম করে দিয়েছে। ইসলামী সমাজে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে যদি তার সামনে অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হতে থাকে, তাহলে সে যেন চুপ করে তা না শোনে বরং তার প্রতিবাদ করে। আর যদি কোনো বৈধ শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কারো সত্যিকার দোষ-ত্রুটিও বর্ণনা করা হতে থাকে, তাহলে এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের আল্লাহকে ভয় করতে এবং এ পাপ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতে হবে। নবী সা. বলেছেন ঃ

"যদি কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোনো মুসলমানকে সাহায্য না করে যেখানে তাকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে এবং তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে সেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন না, যেখানে সে তাঁর সাহায্যের প্রত্যাশা করে। আর যদি কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোনো মুসলমানকে সাহায্য করে যখন তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করা হচ্ছে তাহলে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ ও তাকে এমন পরিস্থিতিতে সাহায্য করবেন যখন সে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী হবে।" (আবু দাউদ)

গীবতকারীকে তওবা করতে হবে

গীবতকারী ব্যক্তি যখনই উপলব্ধি করবে যে, সে এ ঘৃণিত পাপটি করছে অথবা করে ফেলেছে তখন তার প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। এরপর তার ওপর দ্বিতীয় যে কর্তব্য বর্তায় তা হচ্ছে, যতদূর সম্ভব এ গোনাহের ক্ষতিপূরণ করা। সে যদি কোনো মৃত ব্যক্তির গীবত করে থাকে তাহলে সে ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য অধিক মাত্রায় দোয়া করবে। যদি কোনো জীবিত ব্যক্তির গীবত করে থাকে এবং তা অসত্যও হয় তাহলে যাদের সাক্ষাতে সে এ অপবাদ আরোপ করেছিল তাদের সাক্ষাতেই তা প্রত্যাহার করবে। আর যদি সত্য ও বাস্তব বিষয়ে গীবত করে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো তার নিন্দাবাদ করবে না। তাছাড়া যার নিন্দাবাদ করেছিল তার কাছে মাফ চেয়ে নেবে। একদল আলেমের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকে, কেবল তখনই ক্ষমা চাওয়া উচিত। অন্যথায় শুধু তাওবা করলেই চলবে। কারণ, যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত না থাকে এবং গীবতকারী তার কাছে গিয়ে বলে, আমি তোমার গীবত করেছিলাম তাহলে তা তার জন্য মনোকষ্টের কারণ হবে।

গীবত কেন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য?

এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে এ কাজ চরম ঘৃণিত হওয়ার ধারণা দিয়েছেন। মৃতের গোশত খাওয়া এমনিতেই

ঘৃণ্য ব্যাপার। সে গোশতও যখন অন্য কোনো জন্তুর না হয়ে মানুষের হয়, আর সে মানুষটিও নিজের আপন ভাই হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। তারপর এ উপমাকে প্রশ্নের আকারে পেশ করে আরো অধিক কার্যকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে নিজেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, সে কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে প্রস্তুত আছে? সে যদি তা খেতে রাজি না হয় এবং তার প্রবৃত্তি এতে ঘৃণাবোধ করে, তাহলে সে কিভাবে এ কাজ পছন্দ করতে পারে যে, সে তার কোনো মু'মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মান মর্যাদার ওপর হামলা চালাবে, যেখানে তার ঐভাইটি তা প্রতিরোধ করতে পারে না, এমনকি সে জানেও না যে, তাকে বেইজ্জতি করা হচ্ছে। এ আয়াতাংশ থেকে একথাও জানা গেল যে, গীবত হারাম হওয়ার মূল কারণ যার গীবত করা হয়েছে তার মনোকষ্ট নয়, বরং কোনো ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার নিন্দাবাদ করা আদতেই হারাম, চাই সে এ সম্পর্কে অবহিত হোক বা না হোক, কিংবা এ কাজ দ্বারা সে কষ্ট পেয়ে থাক বা না থাক। সবারই জানা কথা, মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া এ জন্য হারাম নয় যে তাতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। মৃত্যুর পর কে তার লাশ ছিঁড়ে খাবলে খাচ্ছে তা মৃতের জানার কথা নয়। কিন্তু সেটা আদতেই অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। অনুরূপ, যার গীবত করা হয়েছে, কোনোভাবে যদি তার কাছে খবর না পৌঁছে, তাহলে কোথায় কোনো ব্যক্তি কখন কাদের সামনে তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ কার কার দৃষ্টিতে সে নীচ ও হীন সাব্যস্ত হয়েছিল, তা সে সারা জীবনেও জানতে পারবে না। না জানার কারণে এ গীবত দ্বারা সে আদৌ কোনো কষ্ট পাবে না। কিন্তু এতে অবশ্যই তার মর্যাদাহানি হবে। তাই ধরন ও প্রকৃতির দিক থেকে কাজটি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া থেকে ভিন্ন কিছু নয়।*

গীবত সম্পর্কে কতিপয় জিজ্ঞাসার জবাব

প্রশ্ন ঃ ১. গীবতের সঠিক সংজ্ঞা কি ?

২. গীবতের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা কতটা সঠিক ?

"কোন ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার কোনো প্রকৃত দোষের কথা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করছে এবং সাথে সাথে আকাংখা পোষণ করছে যে, সে যার দোষ বর্ণনা করছে সে তার এই কাজ (দোষচর্চা) সম্পর্কে অবহিত না হোক।"

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সংজ্ঞা এই দাবী সহকারে পেশ করা হয়েছে যে, "হাদীস শরীফে মহানবী সা. থেকে গীবতের যে সংজ্ঞা উল্লেখিত হয়েছে তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যার কারণে কোনো ব্যক্তি গীবতের সীমা নির্ধারণে ভুলের শিকার হতে পারে। আরও এই যে, মহানবী সা.-এর প্রদত্ত গীবতের সংজ্ঞা চূড়ান্ত ও পূর্ণাংগ নয়।

---

* তাফহীমুল কুরআন, সূরা হুজুরাত, টীকা ঃ ২৬-২৭।

৩. গীবতের শরীয়ত অনুমোদিত শ্রেণীসমূহ কি কি এবং কেন তা জায়েয রাখা হয়েছে? তা বৈধ হওয়ার ভিত্তি কি এই যে, তা মূলতই গীবত নয়? নাকি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে একটি অবৈধ জিনিসকে বৈধ করা হয়েছে?

৪. একথা কি ঠিক যে, মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে রাবীগণের ন্যায়নিষ্ঠা ও দোষত্রুটি যাচাই করেছেন?

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا ؟

"হে মুমিনগণ। যদি কোনো ফাসেক তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে-তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে"-(সূরা হুজুরাত ঃ ৬)।

৫. মুহাদ্দিসগণ স্বয়ং এই কাজ সম্পর্কে কি বলেন?

জবাব ঃ

শরীয়ত প্রণেতা প্রদত্ত গীবতের সংজ্ঞা

১. প্রথম প্রশ্নের জবাব হলো, স্বয়ং শরীয়ত প্রণেতার প্রদত্ত গীবতের সংজ্ঞাই সঠিক ও যথার্থ। সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযিতে হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে মহানবী সা.-এর প্রদত্ত সংজ্ঞাই নিম্নোক্ত বাক্যে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"গীবত এই যে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের উল্লেখ করলে যা তার অপছন্দনীয়। বলা হলো, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বাস্তবিকই উল্লেখিত দোষ থেকে থাকে? এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন ঃ তুমি যা বলেছ প্রকৃতই যদি তা তার মধ্যে থেকে থাকে তবে তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি যা বলেছ, তা যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।"

একই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম মালেক র. মুত্তালিব ইবনে আবদিল্লাহ রা.-এর সূত্রে তাঁর আল-মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

"মুত্তালিব ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে হানতাব আল-মাখযুমী রা. অবহিত করেন যে, "এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট জিজ্ঞাসা করল-গীবত কি? তিনি বললেন ঃ তুমি কোনো ব্যক্তির উল্লেখ এমনভাবে করলে যে, তা শুনলে সে অপছন্দ করবে।[১] সে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! তা যদি সত্য হয়? তিনি বলেন ঃ তুমি যদি বাতিল (মিথ্যা) কথা বল, তবে তা তো অপবাদ।"

---

[১] কেউ যেন ভ্রান্তির শিকার না হয় যে, এ হাদীসে "অনুপস্থিতিতে" কথার উল্লেখ নাই, তাই এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সামনাসামনি খারাপ কথা বলাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। "গীবত" শব্দটির মধ্যেই অবশ্যি "অনুপস্থিতিতে" অর্থ বর্তমান রয়েছে। অতএব গীবতের সংজ্ঞা হিসাবে যখন কোন কথা বলা হবে তখন তার মধ্যে স্বয়ং উপরোক্ত অর্থ নিহিত থাকবে-চাই তা পরিষ্কারভাবে বলা হোক বা না হোক। (প্রবন্ধকার)।

বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে গীবতের শরীয়ত সম্মত অর্থ

মহানবী সা.-এর উপরোক্ত বাণীর আলোকে ইসলামের আলেমগণ গীবতের শরীয়ত সম্মত অর্থ করেছেন নিম্নরূপ ঃ

"কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে নিকৃষ্ট কথা সহকারে তার উল্লেখ করা।"

ইমাম গাযালী র. বলেন ঃ

حَدُّ الْغِيْبَةِ اَنْ تَذْكُرَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ بَلَغَه.

"গীবতের সংজ্ঞা হলো ঃ তুমি তোমার ভাইয়ের উল্লেখ এমনভাবে করলে, যা তার কানে পৌছলে সে তা অপছন্দ করবে।"

হাদীসের প্রসিদ্ধ অভিধান 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে ইবনুল আছীর গীবতের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন ঃ

اَنْ تَذْكُرَ الاِنْسَانَ غَيْبَةً بِسُوْءٍ وَ اِنْ كَانَ فِيْه.

"কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দুর্নাম করা-যদিও তার মধ্যে সেই দুর্নাম থেকে থাকে।"

ইমাম নববী র. গীবতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

ذِكْرُ الْمَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ- سَوَاءٌ ذَكَرْتَه بِا للَّفظِ اَوْ بِالاشَارَةِ وَالرَّمْزِ.

"কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে-চাই তা প্রকাশ্যে করা হোক কিংবা ইশারা-ইংগিতে।"

ইমাম-রাগিব আল-ইসফাহানী বলেন ঃ

هِيَ اَنْ يَّذْكُرَ الاِنْسَانَ غَيْبَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَحْوَجٍ اِلى ذِكْرِ ذَالِكَ .

"নিষ্প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে গীবত।"

সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা বাদরুদ্দীন -আইনী বলেন ঃ

اَلْغِيْبَةُ اَنْ يَّتَكَلَّمَ خَلْفَ اِنْسَانٍ بِمَا يَغُمُّه لَوْ سَمِعَه وَكَانَ صِدْقًا

امَّا اِذَا كَانَ كِذْبًا فَيُسَمَّى بُهْتَانًا.

"গীবত হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বললো যা শুনলে সে চিন্তাগ্রস্ত হবে- এমন কি তা সত্য হলেও। অন্যথায় সে কথা মিথ্যা হলে তার নাম অপবাদ।"

ইবনুত-তাইন বলেন ঃ اَلْغِيْبَةُ ذِكْرُ الْمَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ.

"গীবতের অর্থ হচ্ছে– কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে এমনভাবে তার উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে।"

আল্লামা কিরমানী প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো ঃ

اَلْغِيْبَةُ اَنْ تَتَكَلَّمَ خَلْفَ الانْسَانِ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ سَمِعَهُ . وَلَوْكَانَ صِدْقًا .

"গীবত এই যে, তুমি কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলবে, যা শুনলে সে অপছন্দ করবে-যদিও তা সত্য হয়।"

আল্লামা ইবনে হাজর আল-আসকালানী গীবত ও চোগলখুরি সম্পর্কে বলেন ঃ

اَلْغِيْبَتُ تُوْجَدُ فِىْ بَعْضِ صُوَرِ النَّمِيْمَةِ وَهُوَ اَنْ تَذْكُرَهُ فِى غَيْبَةٍ بِمَا فِيْهِ مِمَّا يَسُوْءُهُ قَاصِدًا بِذَالِكَ الافْسَادِ.

"চোগলখুরির কোনো কোনো পর্যায়ের মধ্যে গীবতও পাওয়া যায়। তা হলো, কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার প্রকৃত দোষ বর্ণনা করা যা তার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়, আর এই বর্ণনার উদ্দেশ্য বিবাদ-বিশৃংখলার সৃষ্টি করা।"

অভিধান, হাদীস ও ফিকহের এসব ইমামগণের মধ্যে কেউই এই শরয়ী বিষয়ের যে সংজ্ঞা স্বয়ং শরীয়ত প্রণেতা প্রদান করেছেন তাকে অপূর্ণাংগ ও ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করে জবাবে নিজেদের প্রদত্ত সংজ্ঞা প্রদান করার দুঃসাহস করেননি। মূলত শরীয়ত প্রণেতাকে অতিক্রম করে শরীয়তের কোনো পরিভাষার তাৎপর্য বর্ণনার অধিকার কারও নেই। শরীয়ত প্রণেতা যখন একটি পরিষ্কার প্রশ্নের পরিষ্কার বাক্যে জবাব প্রদান করেছেন, তখন একজন মুসলমান হিসাবে আমাদের একথা মেনে নিতেই হবে যে, এটাই তার সঠিক অর্থ। মুসলমান তো দূরের কথা একজন অমুসলিম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও এমন কথা বলার দুঃসাহস করতে পারে না যে, শরীয়ত প্রণেতা শরীয়তের একটি পরিভাষার যে অর্থ ব্যক্ত করেছেন তা সঠিক নয়, বরং আমি যে অর্থ করেছি তা সঠিক। এটা এমন একটি অযৌক্তিক কথা, যেমন একটি আইন পরিষদ তাদের প্রণীত আইনের কোনো পরিভাষার অর্থ স্বয়ং তারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর কোনো ব্যক্তি আইন বিশেষজ্ঞ হওয়ার দাবীদার বনে গিয়ে বললো যে, উল্লেখিত আইনের ঐ বিষয়ের আসল সংজ্ঞা তা নয় যা আইন পরিষদ বর্ণনা করেছে, বরং আমার প্রদত্ত সংজ্ঞাই সঠিক।

প্রশ্নকর্তা প্রদত্ত সংজ্ঞার ত্রুটি

প্রশ্ন কর্তার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হলো, আপনি গীবতের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তা না পূর্ণাংগ, না অর্থপূর্ণ। কারণ, এ সংজ্ঞার মধ্যে এমন কতগুলো গীবত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যা সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী বৈধ এবং কতিপয় গীবত তার বাইরে থেকে যায়, যা সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী হারাম। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য করুন ঃ এক ব্যক্তি কারো কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। আপনার জানা আছে যে, সে অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক। আপনি মেয়ের পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ঐ ব্যক্তি এরূপ চরিত্রের লোক। আপনার

উদ্দেশ্য হচ্ছে, মেয়ের পিতা তাকে খারাপ লোক জেনে নিজের জামাতার যোগ্য মনে করবে না। সাথে সাথে আপনি মেয়ের পিতাকেও তাকিদ করে বলে দিলেন যে, খবরদার! তার সম্পর্কে আমি আপনাকে যা বলেছি তা যেন সে জানতে না পারে। এই বিষয়টি যদিও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শরীয়তে বৈধ ও অনুমোদিত রাখা হয়েছে, কিন্তু আপনার উদ্ধৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী তা হারামকৃত গীবতের আওতায় এসে যায়। কারণ তাতে হেয় প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা এবং গোপনীয়তা উভয়ই বর্তমান আছে। অপরদিকে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে, যে কেবলমাত্র মুখরোচক কথা ও ঠাট্টা-উপহাস্যোচ্ছলে নিজের বন্ধুদের মধ্যে বসে কোনো কোনো লোকের দোষ বর্ণনা করে। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য তার নেই (শ্রোতাদের দৃষ্টিতে সে যতোই নিম্নস্তরের লোক হোক না কেন) এবং সে এও পরোয়া করে না যে, তার একথা তাদের কানে পৌছে যায় কি না। এই জিনিস নিঃসন্দেহে শরীয়তে হারাম, কিন্তু তা গীবতের উপরোক্ত সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। কারণ তার মধ্যে না হেয় প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা বর্তমান আছে আর না গোপন করার আকাংখা।

শুধু তাই নয়, শরীয়ত প্রণেতা যে জিনিস সুস্পষ্টভাবে হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাও উপরোক্ত সংজ্ঞার আওতার বাইরে থেকে যায়। হাদীসে এসেছে যে, মায়েয ইবনে মালেক আল-আসলামীকে যেনার অপরাধে যখন রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা হল, তখন মহানবী সা. পথ চলতে চলতে দুই ব্যক্তিকে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেন, এক জন বলছিল, "দেখ ঐ ব্যক্তিকে, আল্লাহ তা'আলা তার অপরাধ গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু তার নিজের নফস তার পিছু ছাড়েনি যতক্ষণ তাকে কুকুরের মত হত্যা না করা হলো।" কিছু দূর অগ্রসর হয়ে রাস্তার পাশে একটি গাধা পড়ে থাকতে দেখা গেল। মহানবী সা. থেমে গেলেন এবং ঐ দুই ব্যক্তিকে ডেকে বললেন ঃ "আস এবং এ গাধার গোশত খাও।" তারা বললো, ইয়া রসূল্লাল্লাহ! তা কে খেতে পারে ? তিনি বললেন ঃ

"এইমাত্র তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ইজ্জতের উপর যে হস্তক্ষেপ করলে তা এই মরা গাধার গোশত খাওয়ার তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট।" -(আবূ দাউদ, কিতাবুল-হুদূদ, বাব রাজমি মায়েয)

এই ঘটনায় স্বয়ং শরীয়ত প্রণেতা সা. গীবত হারাম হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। কিন্তু আপনার উদ্ধৃত সংজ্ঞায় বর্ণিত দুটি শর্তই উল্লেখিত গীবতে অনুপস্থিত। দুই ব্যক্তির যে কথোপকথন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তার বাক্য থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, হযরত মায়েয রা.-কে হেয় প্রতিপন্ন করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তারা এজন্য আক্ষেপ করে বলেছেন যে, তাঁর যে অপরাধ আল্লাহ তা'আলা গোপন রেখেছিলেন, তিনি কেন তা পুনরায় উল্লেখ করে স্বীকার করতে গেলেন এবং রজমের মত ভয়াবহ

শাস্তির সম্মুখীন হলেন। গোপন রাখার আকাংখা ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলা যায় যে, এখানে তার প্রশ্নই উঠে না। কারণ যে ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল, তিনি তো পৃথিবী থেকে ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছেন।

হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তু বৈধ হওয়ার মূলনীতি

তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার পূর্বে একটি কথা ভালভাবে বুঝে নেয়া আপনার জন্য জরুরী মনে করি। শরীয়তে যেসব জিনিস হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা যদি কোনো অবস্থায় বৈধ হয় তবে তা এই কারণে নয় যে, সংশ্লিষ্ট জিনিসের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়েছে। বরং তার কারণ হলো, একটি বিরাট কল্যাণ ও প্রয়োজন তা বৈধ হওয়ার দাবী করছে। ঐ কল্যাণ ও প্রয়োজন যদি তার দাবীদার না হত তবে পূর্ববৎ হারামই থাকত। যতক্ষণ ও যে সীমা পর্যন্ত এই কল্যাণ ও প্রয়োজনের দাবী থাকে, ততক্ষণ ও সেই সীমা পর্যন্ত তা বৈধ হয় ও বৈধ থাকে। ঐ প্রয়োজন দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিস পুনরায় সস্থানে হারাম হয়ে যায়। যেমন মৃত জীব, রক্ত, শূকর, শরাব এবং যে হালাল প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করা হয়েছে-এসবই আল্লাহ তা'আলা হারাম ঘোষণা করেছেন। মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য উপরোক্ত কোনো জিনিস যদি সাময়িকভাবে বৈধ করা হয় তবে তা এই কারণে নয় যে, ঐ সময় মৃতজীব মৃত থাকে না, রক্ত আর রক্ত থাকে না, অথবা শূকর বকরী হয়ে যায়। বরং তা বৈধ হওয়ার কারণ শুধুমাত্র এই যে, মানুষের জীবন নষ্ট করাটা এসব হারাম জিনিসের ব্যবহারের তুলনায় অনেক বেশী খারাপ। এই খারাপ থেকে বাঁচার জন্য যে সময় ও সীমা পর্যন্ত তার ব্যবহার অপরিহার্য হয়-ঐ সময় ও সীমা পর্যন্ত তা আহার করা বৈধ করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নিষিদ্ধ হওয়াটা সব সময় এই দাবী করতে থাকে যে, প্রয়োজনের সীমা যেন চুলপরিমাণও অতিক্রম না করা হয়।

এই মৌল ও নীতিগত সত্যকে সামনে রেখে এখন আপনি তৃতীয় মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা করুন, শরীয়ত প্রণেতার বর্ণিত সংজ্ঞার আলোকে কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দুর্নাম করা স্বয়ং একটি খারাপ কাজ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি গুনাহের কাজ। এই পাপকাজ যদি কখনও বৈধ, নেক অথবা সওয়াবের বিষয় হতে পারে তা কেবলমাত্র এই কারণে যে, একটি প্রকৃত প্রয়োজন তার দাবীদার, তা এমন প্রয়োজন যা পূরণ না করলে গীবতের নিকৃষ্টতা থেকেও নিকৃষ্টতর কাজ সংঘটিত হতে পারে। এইরূপ অবস্থায় তা বৈধ হওয়ার কারণ এই নয় যে তা মূলতই গীবত নয়, কিংবা তা মূলত হারাম নয়; বরং এর কারণ কেবলমাত্র বাস্তব জীবনের সেই সব প্রয়োজন যা শরীয়তের দৃষ্টিতে অতীব মূল্যবান। এর মধ্যে কোনো প্রয়োজন দাবীদার না হলে অনুপস্থিতিতে কারো বদনামী করা কোনো ভালো কাজ নয় যে-শরীয়ত তা নিষ্প্রয়োজনে সাধারণভাবে বৈধ করে রাখবে।

গীবতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করার ভিত্তি

গীবতের অবৈধতা থেকে যেসব জিনিস ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে তার সর্বপ্রথম ভিত্তি শরীয়ত প্রণেতার নিম্নোক্ত নীতিগত বাণী ঃ

সাঈদ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। মহানবী সা. বলেন ঃ "নিকৃষ্টতম বাড়াবাড়ি হলো-অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের মান-সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করা।" - (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ফিল-গীবাত)

এই "অন্যায়ভাবে" শব্দটি ব্যবহার দ্বারা পরিষ্কার জানা যায়, "ন্যায়ের" খাতিরে তা করা জায়েয। আর এই "ন্যায়"-এর ব্যাখ্যা ও মহানবী সা.-এর সুন্নাতের দৃষ্টান্ত থেকেই জানা যায়। যেমন–

এক বেদুইন এসে রসূলুল্লাহ সা.-এর পিছনে নামাযে শরীক হল। নামায শেষ হতেই সে এই কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছিল ঃ "হে খোদা! আমার উপর ও মুহাম্মাদ সা.-এর উপর রহম কর, আমাদের দুজন ছাড়া আর কাউকে এই দয়ায় শরীক কর না।" মহানবী সা. সাহাবাদের বলেন ঃ

"তোমরা কি বল, এই ব্যক্তি অধিক নাদান না তার উট? তোমরা কি শুনতে পাওনি সে কি বলেছে?" - (আবূ দাউদ)

মহানবী সা. হযরত আয়েশা রা.-এর কক্ষে ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে সাক্ষাত প্রার্থনা করল। মহানবী সা. বলেন ঃ এ হচ্ছে স্বগোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি। অতপর তিনি বের হয়ে আসেন এবং সাক্ষাতপ্রার্থীর সাথে ভদ্র ব্যবহার করেন। ঘরের ভেতর ফিরে এলে আয়েশা রা. আরয করেন, আপনি তো তার সাথে নম্র ব্যবহার করলেন। অথচ যাওয়ার সময় তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ

"যার অশিষ্ট ব্যবহারের ভয়ে লোকেরা তার সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তার স্থান হবে সর্বনিকৃষ্ট।" - (বুখারী, মুসলিম)

ফাতিমা বিনতে কায়েস রা. থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মুয়াবিয়া রা. ও আবুল জাহম রা. উভয়ে তাঁর নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠান। তিনি মহানবী সা. এর অভিমত জানতে চান। জবাবে রসূল সা. বলেন ঃ

"মুবায়িবা দরিদ্র ব্যক্তি তার কোনো সম্পদ নাই। আর আবুল জাহম স্ত্রীদের খুব মারে।" - (বুখারী, মুসলিম)

আবু সুফিয়ান রা.-এর স্ত্রী হিন্দ এসে রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট আরয করেন, আবূ সুফিয়ান কৃপণ লোক। তিনি আমাকে ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন না। – (বুখারী, মুসলিম)

গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ

এই ধরনের নজীরসমূহ থেকে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত মূলনীতি গ্রহণ করেছেনঃ যে 'ন্যায় ও সত্যের' কারণে কোনো ব্যক্তির জন্য খারাপ কাজ বৈধ হয় তার অর্থ এমন

সব প্রকৃত প্রয়োজন যার জন্য এরূপ করা ছাড়া উপায় থাকেনা। পুনরায় এই মূলনীতির ভিত্তিতে তাঁরা সুনির্দিষ্ট করে কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে গীবত করা যেতে পারে অথবা করা উচিৎ। আল্লামা ইবনে হাজর র. তাঁর বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে ঐসব ক্ষেত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, গীবত এমন প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক ও যথার্থ এবং উক্ত উদ্দেশ্য কেবল এ পথেই অর্জিত হতে পারে। যেমন জুলুম-নির্যাতনের প্রতিকার প্রার্থনা, কোনো খারাবী বা অনিষ্ট দূর করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা, কোনো শরয়ী মাসআলার জন্য ফতোয়া চাওয়া, ন্যায় বিচারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া, কারো অনিষ্ট থেকে লোকদের সতর্ক করা এবং এর মধ্যে হাদীসের রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও সাক্ষীদের দোষত্রুটি বিশ্লেষণও এসে যায়, কোনো কর্মকর্তাকে তার অধীনস্থ কর্মকর্তার খারাপ চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করা, বিবাহ ও দৈন্দনিন লেনদেনের বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা, কোনো ফিকহের ছাত্রকে কোনো ফাসেক ও বিদআতী ব্যক্তির নিকট যাতায়াত করতে দেখে তার খারাপ চরিত্র সম্পর্কে তাকে সতর্ক করা ইত্যাদি। তাছাড়া যেসব লোকের গীবত করা বৈধ তারা হচ্ছে-প্রকাশ্যে দুষ্কর্ম, জুলুম-অত্যাচার ও বিদআতী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি। (ফাতহুল বারী, খ. ১০ পৃ. ৩৬২)।

ইমাম নববী র. মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্তে ও রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ সৎ ও শরীয়ত সম্মত উদ্দেশ্য সাধন যদি গীবত ছাড়া সম্ভব না হয় তাহলে এ ধরনের গীবতে কোনো দোষ নেই। ছয়টি কারণে এরূপ হতে পারে। এর অধিকাংশের উপর আলেমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সমর্থনে মশহুর হাদীসসমূহ থেকে দলীল পেশ করা হয়েছে।

প্রথম কারণ ঃ জুলুমের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করা। নির্যাতিত ব্যক্তি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক বা এমন সব লোকের কাছে যালেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে পারে যালেমদের দমন করার শক্তি বা কর্তৃত্ব এবং মজলুমের প্রতি ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা যাদের আছে। এক্ষেত্রে সে বলতে পারে অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং সৎ কাজের মাধ্যমে গুনাহের কাজের সুযোগ বন্ধ করার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বলা। এ উদ্দেশ্যে কারো কাছে-যার দ্বারা খোদাদ্রোহী কার্যকলাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে তার বিরুদ্ধে-এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি এই রকম কাজ করছে। আপনি তাকে শাসিয়ে দিন। তার উদ্দেশ্য হবে শুধু অবৈধ কার্যকলাপ উদঘাটন ও তার প্রতিরোধ। এই রকম উদ্দেশ্য না থাকলে অযথা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হারাম।

তৃতীয় কারণ ঃ কোনো বিষয়ে ফতওয়া চাওয়া। মুফতী সাহেবের কাছে গিয়ে বলা যে, আমার উপর আমার বাপ, ভাই, স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি এইভাবে জুলুম করছে।

তার জন্য এসব করা কি উচিৎ? তার হাত থেকে আমার বাঁচার, অধিকার আদায় করার এবং জুলুম প্রতিরোধ করার কি পন্থা আছে? প্রয়োজন বশত এসব কথা এবং এ ধরনের আরো কথা বলা জায়েয। কিন্তু সঠিক ও সর্বোত্তম পন্থা হলো এভাবে বলা যে, 'কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো স্বামী যদি এরূপ আচরণ করে তবে তার ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?' কারণ এভাবে বললে কাউকে নির্দিষ্ট না করেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এসব সত্ত্বেও ব্যক্তির নামোল্লেখ করাও জায়েয। এটা যেমন হিন্দ আবূ সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

চতুর্থ কারণ ঃ মুসলমানদেরকে কারো খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা এবং উপদেশ দেয়া এটা কয়েকভাবে হতে পারে ঃ

ক. হাদীসের বর্ণনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে যেসব ব্যক্তির দোষত্রুটি আছে, যাচাই বাছাই করে তা বলে দেয়া। মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে এটা শুধু জায়েযই নয়, বরং বিশেষ অবস্থায় ওয়াজিবও। যেমন কোনো লোককে বিয়ের ব্যাপারে, কারো সাথে কোনো বিষয়ে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে, আমানত ও লেনদেনের ব্যাপারে, কিংবা কাউকে প্রতিবেশী বানানোর ব্যাপারে খোজ-খবর নেয়া ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পরামর্শদাতার কর্তব্য হলো তথ্য গোপন না করা, বরং নসীহতের নিয়তে খারাপ দিকগুলো উল্লেখ করা উচিত। যখন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, সে শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সন্দেহ ও উৎকণ্ঠায় পতিত হয়েছে অথবা কোনো ফাসেক ব্যক্তিকে তার কাছে জ্ঞানার্জন করতে দেখা যাচ্ছে এবং এই সুযোগ তার ঐ ব্যক্তির ক্ষতি করার আশংকা থাকলে তখন তার কাছে উপদেশের মাধ্যমে ফাসেক ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া কর্তব্য। এসব ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝিরও যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদানকারীকে হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হতে হয়। কখনও শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়ে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, এটা নিছক উপদেশ বৈ কিছু নয়। সুতরাং ব্যাপারটাকে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে অগ্রসর হতে হবে।

খ. কোনো লোককে কোনো বিষয়ে জিম্মাদার বা দায়িত্বশীল বানানো হলো। কিন্তু সে তা পালনে অক্ষম অথবা সে ঐ পদের অনুপযুক্ত, অথবা সে ফাসেক বা অলস ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যার এসব বিষয়ে কর্তৃত্ব রয়েছে এবং যে ইচ্ছা করলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিংবা অন্য কোনো যোগ্য লোককে দায়িত্ব দিতে পারে অথবা সে তাকে ডেকে নিয়ে তার যাবতীয় দুর্বলতা দেখিয়ে দেবে এবং সে সংশোধন হয়ে উপযুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। এতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার সম্পর্কে অমূলক ধারণা বা ধোঁকায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে। সে তাকে ডেকে নিয়ে একথাও বলতে পারে, হয় সে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করবে নতুবা তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে।

পঞ্চম কারণ ঃ কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসেকী ও বিদ'আতী কাজ করে। যেমন প্রকাশ্যে মদ পান করে, মানুষের উপর জুলুম করে, কারো ধন-সম্পদ জোরপূর্বক হরণ

করে, জনসাধারণের কাছে থেকে অন্যায়ভাবে কর বা চাঁদা আদায় করে, অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় ইত্যাদি। এই ব্যক্তির কার্যকলাপের আলোচনা করা যাবে। এক্ষেত্রে তার কৃত কুকর্ম ছাড়া অন্য কিছু বলা জায়েয নয়। তবে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও অন্য কোনো কারণ থাকলে ভিন্ন কথা।

ষষ্ঠ কারণ ঃ পরিচয় দেয়া ঃ কোনো ব্যক্তিকে তার বিশেষ উপাধি বা তার কোনো দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে পরিচয় করিয়ে দেয়া জায়েয। যেমন রাতকানা, পঙ্গু, বধির, অন্ধ, টেরা ইত্যাদি এভাবে কারো পরিচয় দেয়া জায়েয। তবে খাট করা বা অসম্মান করার উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার করা হারাম। এসব ত্রুটির উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনোভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে সেটাই উত্তম।

উলামায়ে কেরাম এই ছয়টি কারণ বর্ণনা করেছেন। এর অধিকাংশই ইজমার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসিদ্ধ হাদীসে এসবের দলীল প্রমাণ রয়েছে। (সহীহ্ মুসলিম, বাব তাহরীমিল গীবাত; রিয়াদ, বাব-মা ইউবাহু মিনাল-গীবাত)।

এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের (ইমাম ইবনে হাজর ও ইমাম নববী র.) বর্ণনাসমূহ থেকে দুটি জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এক, গীবতের যেসব পন্থা জায়েয অথবা অপরিহার্য বলা হয়েছে-তা জায়েয বা অপরিহার্য হওয়ার কারণ এই নয় যে, তা মূলতই গীবত নয়। বরং তার কারণ হচ্ছে শরীয়তের যথার্থ ও সঠিক উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন, যার জন্য একটি প্রকৃতই হারাম জিনিস প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত বৈধ বা অপরিহার্য করা হয়েছে। ইসলামের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হারাম জিনিসের বৈধতাকে ঐ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তা থেকে কতিপয় সাধারণ মূলনীতি বের করে তার ভিত্তিতে এমন কতগুলো বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা বৈধ ও অপরিহার্য হওয়া ফতোয়া দিয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত সুন্নাতে বর্তমান নেই।

মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক হাদীসের রাবীগণের ন্যায়নিষ্ঠা ও দোষত্রুটি যাচাইয়ের ভিত্তি

এবার চতুর্থ প্রশ্নটি আলোচনা করা যাক। কুরআন মজীদের যে আয়াত সম্পর্কে বলা হয় যে, মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনাকারীদের ন্যায়নিষ্ঠা ও দোষত্রুটি جرح وتعديل পর্যালোচনার যাবতীয় কাজ উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে করেছেন তার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ

"হে ঈমানদারগণ! কোনো ফাসেক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোনো খবর নিয়ে আসে তবে তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোনো মানবগোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে পড়বে।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৬)

এ আয়াতের দাবী হলো"কোন ফাসেক ব্যক্তি কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সেই খবরের সত্যতা যাচাই করে দেখো-তা সঠিক কিনা?" অথচ মুহাদ্দিসগণ রাবীগণের চরিত্র ও কার্যকলাপের মূল্যায়নের যে কাজ করেছেন তা এই যে, "কোন ব্যক্তি যখন তোমাদের নিকট খবর নিয়ে আসে তখন তার চরিত্র ও কার্যকলাপের মূল্যায়ন করো। যদি সে দুষ্কর্মপরায়ণ লোক হয় তবে শুধুমাত্র তার খবরই প্রত্যাখ্যান করবে না, বরং সাধারণ্যে প্রচারও করে দাও যে, অমুক ব্যক্তি দুশ্চরিত্র ও দুষ্কৃতিপরায়ণ, তার পরিবেশিত তথ্য গ্রাহ্য করো না।"

এই দুটি কথা পাশাপাশি রেখে লক্ষ্য করুন, আপনার জ্ঞানবুদ্ধি কি এই সাক্ষ্য দেয় যে, শেষোক্ত কথাগুলো পূর্বোক্ত কথাগুলোর অনুরূপ এবং তার কোনো অংশ পূর্বোক্ত কথার বিপরীত নয়?

মূলত এই দলীল পেশ করার সময় একথা হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করা হয়নি যে, রাবীগণের চরিত্র ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের কাজের ধরন কি ছিল? এ কাজের একটি অংশ এই ছিল যে, যেসব লোক মিথ্যাবাদী, অথবা ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী অথবা কোনো দিক থেকে অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য, তাদের পরিবেশিত খবর সমর্থন করা যাবে না। এর দ্বিতীয় অংশ এই ছিল যে, সাধারণ লোকদের এবং হাদীসের শিক্ষার্থীদের এ ধরনের রাবীদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে এবং বই-পুস্তকে তাদের দোষত্রুটি প্রমাণ করে দেখাতে হবে, যাতে করে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকে। উপরোক্ত আয়াত এবং অন্যান্য নস (কুরআন-হাদীসের দলীল) থেকে কেবল প্রথম অংশের সমর্থন পাওয়া যায়। অতএব ইমাম মুসলিম র. সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় এই অংশের সমর্থনে তা থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। অবশ্য দ্বিতীয় অংশের সমর্থনে কোনো নস বর্তমান নাই, বরং তাকে গীবত হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে তা বৈধ ও অপরিহার্য হওয়ার সমর্থনে সমস্ত মুহাদ্দিসগণ এই প্রমাণ পেশ করেন যে, যদি এ কাজ না করা হয় তবে মিথ্যাবাদী, বিদআতী ও দুর্বল রাবীদের বর্ণিত ভ্রান্ত রিওয়ায়াত থেকে মুসলমানদের দীনকে রক্ষা করা যাবে না। এ ব্যাপারে ইমাম নববী র. ও ইবনে হাজার র.-এর বর্ণনা আপনি এইমাত্র উপরে দেখেছেন। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের নিজস্ব ব্যাখ্যা

পাঁচ নম্বর প্রশ্নের জবাব হলো, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউই নিজের কাজের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে না এ কথা বলেছেন যে-তা গীবত নয়, আর না এই প্রমাণ পেশ করেছেন যে, আমাদের এ কাজের অনুমতি অমুক আয়াত অথবা অমুক হাদীসে দেয়া হয়েছে। বরং তাঁরা বলেছেন যে, দীনকে বিকৃতি থেকে বাঁচানোর জন্য এবং মুসলিম সর্বসাধারণকে অনির্ভরযোগ্য রাবীদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ করার জন্য এই গীবতে লিপ্ত হওয়া জায়েয, বরং অপরিহার্য। যে যুগে রাবীগণের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয় সে সময়

প্রবলভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের এই গীবত করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে রাবীদের বিশ্বস্ততা যাচাইকারী মুহাদ্দিস ইমামগণ নিজেদের সঠিক অবস্থান পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত করার জন্য তারা নিজেরা যেসব কথা বলেছিলেন তা দেখে নিন।

মুহাম্মাদ ইবনে বুনদার বলেন, আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-কে বললাম, আমার একথা বর্ণনা করতে অত্যন্ত ভয় হচ্ছে যে, অমুক রাবী দুর্বল এবং অমুক মিথ্যাবাদী। ইমাম সাহেব বললেন ঃ

"তুমিও যদি নীরব থাকো এবং আমিও যদি নীরব থাকি তবে অজ্ঞ লোকেরা কিভাবে সহীহ ও ভ্রান্ত হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করবে?"

আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, আমার পিতা হাদীস ও রাবীদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছিলেন ঃ অমুক ব্যক্তি দুর্বল এবং অমুক ব্যক্তি বিশ্বস্ত। এতে আবু তুরাব বাখশী বললেন, হে শায়খ! আলেমগণের গীবত করবেন না। একথার উত্তরে আমার পিতা বললেন, "আমি কল্যাণ কামনা করছি, গীবত করছি না।"

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. এক রাবী সম্পর্কে বলেন ঃ সে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে। এক সূফী আপত্তি করে বললেন ঃ এতো আপনি গীবত করছেন। ইবনুল মুবারক র. জবাব দিলেন ঃ

"চুপ থাক, আমরা যদি এ কথা বর্ণনা না করি, তবে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা যাবে?"

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান র. কে বলা হলো, আপনার কি ভয় হচ্ছে না যে আপনি যেসব লোকের দোষত্রুটি বর্ণনা করছেন তারা কিয়ামতের দিন আপনাকে পাকড়াও করবে? তিনি জবাব দেন, তারা যদি আমাকে পাকড়াও করে তবে তা আমার জন্য মহানবী সা.-এর পাকড়াও-এর তুলনায় সহজতর হবে। কারণ সেদিন মহানবী সা. আমার জামার কাছা টেনে ধরে বলবেন ঃ যে হাদীস সম্পর্কে তুমি জানতে যে, তা মিথ্যা, এমন হাদীস তুমি আমার নামের সাথে সম্পৃক্ত হতে দিলে কেন? তখন আমি কি বলবো?

শো'বা ইবনুল হাজ্জাজকে বলা হলো, আপনি কতিপয় লোকের কার্যকলাপের সমালোচনা করে তাদের অপমান করলেন। ভালো হতো যদি আপনি তা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি বলেন, আমাকে আজকের একটি রাত অবকাশ দাও যাতে আমি আমার ও আমার স্রষ্টার মধ্যে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে পারি যে, এ কাজ আমার জন্য ত্যাগ করা কি জায়েয? পরবর্তী দিবসে তিনি বের হয়ে বললেন ঃ

"আমি আমার ও আমার সৃষ্টিকর্তার মাঝখানে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছি। জনগণের উপকারার্থে এবং ইসলামের জন্য ঐসব বর্ণনাকারীর সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা ছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর নাই।"

আবদুর রহমান ইবনুল মাহদী বলেন, আমি ও শো'বা পথ চলাকালে এক ব্যক্তিকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখলাম। শো'বা বললেন ঃ

"আল্লাহ্‌র শপথ! সে মিথ্যা বলছে। এ সম্পর্কে নীরব থাকাটা আমার জন্য বৈধ নয়, অন্যথায় আমি নীরব থাকতাম।"

এই শো'বার বিভিন্ন ছাত্র বলতেন, তিনি রাবীদের দোষত্রুটি নির্দেশ جرح-কে "আল্লাহ্‌র রাস্তায় গীবত" এবং "আল্লাহ্‌র জন্য গীবত" বলে আখ্যায়িত করতেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বর্ণনা থেকে জানা যায়, শো'বা বলতেন ঃ

"এসো আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে কিছু গীবত করি।"

আবু যায়েদ আনসারী বলেন, একদিন আমরা শো'বার নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আজ হাদীস বর্ণনা করার দিন নয়, আজ গীবত করার দিন। আসো মিথ্যাবাদীদের কিছুটা গীবত করি।[১]

ইমাম মুসলিম র. তাঁর সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থের ভূমিকায় রাবীগণের চরিত্র ও কার্যাবলীর মূল্যায়ন جرح وتعديل করার এই কাজের সমর্থন করে লিখেছেন ঃ

"বিশেষজ্ঞ আলেমগণ যে কারণে হাদীসের রাবী ও খবর পরিবেশনকারীদের দোষত্রুটি প্রকাশের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসাকারীদের একাজের বৈধতা সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন, তা ছিল এই যে, তা না করলে মারাত্মক ক্ষতির আশংকা আছে। কেননা দীনের কোনো কথা বর্ণনা করলে তার মাধ্যমে হয় কোনো কাজ হালাল অথবা হারাম প্রমাণিত হয়, অথবা তাতে কোনো কাজের নির্দেশ অথবা নিষেধ থাকবে, অথবা এর মাধ্যমে কোনো কাজ করতে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করা হবে। কোনো রাবীর মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততা না থাকে, আর অন্য রাবী তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনার সময় তার সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তার সম্পর্কে অনবহিত লোকদের সামনে যদি তার দোষত্রুটি তুলে না ধরে, তবে সে গুনাহগার হবে এবং মুসলিম জনসাধারণের সাথে প্রতারণাকারী বলে গণ্য হবে। কারণ এসব হাদীস যারা শুনবে তারা তদনুযায়ী বা তার কোনো একটি অনুযায়ী আমল করবে। অথচ এর সবগুলো বা অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।"

এ হচ্ছে রাবীদের দোষত্রুটি উন্মোচিত করার সপক্ষে একজন মহান হাদীস বেত্তার যুক্তিপ্রমাণ। উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যায় ইমাম নববী র. লিখেছেন ঃ "জেন রাখ! রাবীদের দোষত্রুটি নির্দেশ করা সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী জায়েয বরং অপরিহার্য। কারণ মহান শরীয়তকে (মিশ্রণ থেকে) রক্ষার প্রয়োজন এটা দাবী করে। আর একাজ হারামকৃত গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং আল্লাহ, তাঁর রসূল সা. ও মুসলমানদের কল্যাণকামিতার

---

১. এই সমস্ত ঘটনা ও বক্তব্য আল-বাগদাদী র. তাঁর আল-কিফায়া ফী ইলমির রিওয়াইয়া শীর্ষক গ্রন্থ থেকে নকল করা হয়েছে, পৃ-৪৩-৪৬ দ্র.-(প্রবন্ধকার)।

অন্তর্ভুক্ত সম্মানিত ইমামগণ, তাদের প্রবীণগণ এবং তাদের মধ্যে যাঁরা তাকওয়া-পরহেযগারীতে খ্যাতিমান ছিলেন তাঁরা একাজ করেছেন।"– (সহীহ মুসলিমের আরবী ভূমিকা, পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির নীচে)।*

আরো কিছু প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ "তরজমানুল কুরআন" পত্রিকার "১৯৫৯ সনের জুন সংখ্যায় গীবত ও তার হুকুম সম্পর্কে আপনি যে ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন তা অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু এরপর পুনরায় এমন কিছু আলোচনা দৃষ্টিগোচর হল যাতে চিন্তা ও মন-মানসিকতায় জটিলতার সৃষ্টি করে। আপনি কি এ ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত কথা বলে দিতে পারেন না যা দুই+দুই=চার-এর মত তার যথার্থ শরয়ী মর্যাদা প্রতীয়মান হয় এবং লোকেরা অতঃপর আর কোনো জটিলতার শিকার হবে না?"

জবাব ঃ প্রতিবাদকারীদের প্রদত্ত গীবতের সংজ্ঞা এবং শরীয়ত প্রণেতার প্রদত্ত সংজ্ঞার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ও তার পরিণতি

তরজমানুল কুরআনের জুন (১৯৫৯ খৃ.) সংখ্যায় আমি সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে গীবতের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছিলাম তা আপনি পুনরায় পাঠ করুন। এক দৃষ্টিতেই আপনি জানতে পারবেন যে, মহানবী সা.-এর বাণীর আলোকে কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার প্রকৃত দোষত্রুটির চর্চা করাই গীবত। কিন্তু এর বিপরীতে শরীয়ত প্রণেতা নন-এমন এক ব্যক্তি গীবতের যে সংজ্ঞা প্রদান করেন তার আলোকে এই নিকৃষ্ট কথা কেবল সেই অবস্থায় গীবতের পর্যায়ে পড়বে যখন তা অপদস্থ ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যে করা হবে এবং গীবতকারীর আকাংখা এই হবে যে, যার দোষ বর্ণনা করছে সে তা অবহিত না হোক। স্পষ্টতই উপরোক্ত সংজ্ঞা অপরাপর বিশেষজ্ঞ আলেম ও ইমামগণের সংজ্ঞার মত আইন প্রণেতার প্রদত্ত সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নয়, বরং উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট মৌলিক পার্থক্য রয়েছে যার ফলে গীবতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

প্রথম ঃ আইন প্রণেতার (রসূল সা.-এর) সংজ্ঞা মূলত কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষত্রুটি বর্ণনাকে হারাম করেছে। কিন্তু যিনি আইন প্রণেতা নন এমন ব্যক্তির উপরোক্ত সংজ্ঞা এই হারামকে শুধুমাত্র এমন দোষত্রুটির বর্ণনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয় যার মধ্যে অপমান, অপদস্থ ও খাটো করার উদ্দেশ্য এবং গোপনীয়তার আকাংখা বর্তমান। এ ছাড়া আর সব দোষত্রুটি উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে সাধারণত বৈধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ শরীয়ত প্রণেতার সংজ্ঞা সমাজকে গীবতের এমন একটি মাপকাঠি প্রদান করে যার ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব পরিবেশে এই নিকৃষ্ট দোষ চর্চার প্রতিরোধ করতে পারে। কারণ 'দোষ চর্চা' ও 'অনুপস্থিতিতে'-এই দু'টি অংশ যেখানেই একত্র হয়

---

* তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৫৯ সংখ্যা।

সেখানেই শ্রোতা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, এখানে গীবতের চর্চা হচ্ছে। কিন্তু যিনি আইন প্রণেতা নন তার উপরোক্ত সংজ্ঞা সমাজকে এরূপ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে। কারণ এক ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও আকাংখা অন্যদের পক্ষে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। তার বিচারক কেবল দোষ চর্চাকারী স্বয়ং হতে পারে, কিংবা স্বয়ং আল্লাহ, যাঁর ভয় কারো মনে থাকলে সে গীবত থেকে দূরে থাকবে, অন্যথায় নিজের সৎ উদ্দেশ্য ও গোপন আকাংখা থেকে মুক্ত হয়ে ইচ্ছামত যার-তার গীবত করে বেড়াবে। সমাজের কেউই তার মুখ বন্ধ করতে পারবে না।

তৃতীয়ত ঃ শরীয়ত প্রণেতা অনুপস্থিতিতে দোষ অর্থাৎ চর্চাকে মূলতই হারাম সাব্যস্ত করার পর তাকে কেবল একটি অবস্থায় বৈধ করেছেন যখন 'সত্যের' খাতিরে তার প্রয়োজন হয়। তা এমন কোনো প্রয়োজন যা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি সঠিক ও বিবেচনাযোগ্য প্রয়োজন হিসাবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু যিনি শরীয়ত প্রণেতা নন তার প্রস্তাব ও ধারণা এক ধরনের দোষচর্চাকে তো চূড়ান্তভাবে হারাম করে যা বৈধ হওয়ার কোনো পথ নেই আর অন্য ধরনের দোষচর্চাকে সাধারণতই হালাল করে দেয় যার সাথে 'প্রয়োজন' অথবা 'সৎ উদ্দেশ্যে'র কোনো শর্ত সংযুক্ত নেই।

চতুর্থত ঃ শরীয়ত প্রণেতার আরোপিত "বৈধতার শর্তাবলী' সমাজকে এতটা উপযুক্ত বানায়, তার পারিপার্শিকতায় যে দোষচর্চাই হবে তা যাচাই করে প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারে যে, তা বৈধ প্রকৃতির দোষচর্চা কিনা? কারণ যথার্থ শরয়ী উদ্দেশ্য অথবা প্রয়োজন তো এমন জিনিস যা যাচাই ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা যায়। দোষচর্চাকারীকে প্রত্যেক ব্যক্তিই জিজ্ঞেস করতে পারে যে, কারো অনুপস্থিতিতে তুমি তার দোষচর্চা করছ তার কি প্রয়োজন আছে অথবা এর দ্বারা কোনো বৈধ ও যুক্তিগ্রাহ্য উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাচ্ছ? সে যদি এটাকে যথার্থ ও শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমোদনযোগ্য প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে পারে অথবা তা আপনা আপনি শ্রোতার বুঝে এসে যায়, তবে তা বরদাশত করা যেতে পারে। অন্যথায় যে কোনো শ্রোতা তাকে বলে দিতে পারে যে, তোমাকে যদি তোমার অন্তরের উষ্মা প্রকাশ করতে হয় তবে নিজের বাড়ীতে গিয়ে তা কর, গীবতের এই গুনাহের সাথে অযথা আমাদের জড়াচ্ছ কেন?

কিন্তু আইন প্রণেতা নয় এমন ব্যক্তি একদিকে তো প্রয়োজনে গীবতের বৈধতার দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে এবং অপরদিকে লোকদেরকে এমন প্রতিটি দোষচর্চার খোলা অনুমতি দেয়, যে সম্পর্কে সে এই দাবী করে যে, খাটো করা বা অপমানিত করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং আমি গোপন রাখার আকাংখাও পোষণ করি না। এরপর সমাজে আর কোনো ব্যক্তি এই প্রশ্ন তুলতে পারে যে, জনাব, কি প্রয়োজনে এই কাজ করা হচ্ছে?

পঞ্চমত ঃ শরীয়ত প্রণেতার আরোপকৃত বৈধতার শর্তাধীনে যে দোষত্রুটিই বর্ণনা করা হবে তার উপর সেই সমস্ত সীমা ও শর্তাবলী আরোপিত হবে, যা শরীয়তে উপরোক্ত ধরনের হারাম কাজের প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে এবং যা একান্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে

বৈধ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ–

১. যে অবস্থায় এ ধরনের দোষক্রুটি বর্ণনা করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না।

২. যতটুকু দোষ বর্ণনা করা বাস্তবিকপক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কেবলমাত্র ততটুকুই বর্ণনা করা যাবে।

৩. প্রয়োজন দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথে দোষক্রুটি বর্ণনার বৈধতাও শেষ হয়ে যায় এবং ঐ কাজ পুনরায় হারাম হয়ে যায়। যেমন, শুকরের গোশত মূলতই হারাম এবং জান বাঁচানোর আওতায় কেবলমাত্র একান্ত প্রয়োজনে ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমাণ এবং প্রয়োজনের ন্যূনতম সীমা পর্যন্তই তা ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা হতে পারে না যে, ক্ষুধা পেলেই লোকেরা শূকর খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং উদর পূর্তি করে আহার করবে আর অন্য সময়ের জন্য তা কাবাব করে রেখে দেবে। অথবা বলা যায়, মানব হত্যা মূলতই হারাম এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ। হত্যা কেবল তখনই করা যেতে পারে যখন পূর্ণ সতর্কতা সহকারে তা অপরিহার্য হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং কেবলমাত্র ততটুকুই হত্যাকান্ড ঘটানো যায় যতটুকু বাস্তবিকপক্ষেই জরুরী। প্রয়োজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে হত্যাকান্ড থেকে বিরত হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। ঠিক এই শর্তাবলীই গীবতের ক্ষেত্রেও আরোপিত হবে। অর্থাৎ তা মূলতই হারাম এবং একান্ত প্রয়োজনে অনুমোদিত। কিন্তু যে ব্যক্তি শরীয়ত প্রণেতা নয় সে তার প্রদত্ত সংজ্ঞায় যে জিনিস গীবতের অন্তর্ভুক্ত করেছে সে তা কোনো প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বৈধ করে না এবং যা সে এই সংজ্ঞা বহির্ভূত রাখে তার উপর উপরোক্ত শর্তাবলীর কোনোটিই আরোপিত হয়না।

শরীয়ত প্রণেতার সংজ্ঞা ও যে ব্যক্তি শরীয়ত প্রণেতা নয় তার সংজ্ঞার মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্য বিদ্যমান, যা গীবতের প্রকৃতি ও তার বিধানের মধ্যে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়। এখন যার ইচ্ছা শরীয়ত প্রণেতার কথা মানবে আর যার ইচ্ছা অন্যদের কথা অনুসরণ করবে। ইতোপূর্বে (জুন সংখ্যায়) আমি ইবনে হাজার র. ও নববী র.-এর যে বাক্য উদ্ধৃত করেছি তা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এই মাসআলার ব্যাপারে উম্মতের আলেমগণ সঠিক শরয়ী মর্যাদা তাই বুঝেছেন যা আমি বর্ণনা করেছি। আর হাদীস বিশারদগণ রাবীগণের দোষগুণ যাচাই ও পর্যালোচনার جرح وتعديل যে কাজ করেছেন তা এই মনে করে করেননি যে, সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে গোপন রাখার আকাংখা ব্যতিরেকে প্রত্যেক ব্যক্তির দোষক্রুটি ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রচার করে বেড়ানো তাদের জন্য মূলতই এবং সাধারণতই বৈধ, বরং তাঁরা এই কাজ আসলেই হারাম এবং একান্ত প্রয়োজনে অনুমোদিত মনে করেই করেছেন। এজন্য তাঁরা এর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছেন। তাই তাঁরা শুধুমাত্র প্রয়োজন পরিমাণ হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণের দোষক্রুটি যাচাই করেছেন এবং তাদের এমন সব দোষক্রুটি যাচাই করেছেন যার প্রভাব হাদীসের যথার্থতার উপর প্রতিফলিত হতে পারে। এজন্য তাঁরা সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের

সীমা পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গেছেন, এই সীমা তাঁরা সাধারণত লংঘন করেননি। আর যে কেউ তা অতিক্রম করলে অপরাপর মুহাদ্দিসগণ তার প্রতিবাদ করেছেন।

কোন ব্যক্তি হয়ত যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে যে, অমুক অমুক কাজের যেহেতু হুকুম দেয়া হয়েছে, তাই এই হুকুম পালণ করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের অনুপস্থিতিতে তাদের যে দোষক্রটি বর্ণনা করা হবে তা সরাসরি হালাল এবং ভালো কাজ, বরং তা গীবতের সংজ্ঞা বহির্ভূত। আপনি সামান্য চিন্তা করলই অনুধাবন করতে পারবেন যে, এটা সম্পূর্ণতই একটা বাতিল যুক্তি। শরীয়তের কোনো ইতিবাচক নির্দেশ তার কোনো নেতিবাচক নির্দেশকে সরাসরি শেষ করে দিতে পারে না। ফরজ অথবা ওয়াজিব নির্দেশই হোক অথবা মুস্তাহাব বা ভালো কাজই হোক, তা কেবল শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায়ই সম্পাদন করতে হবে। অবাঞ্ছিত ও নিষিদ্ধ কাজ শুধু এই যুক্তিতে বৈধ করা যায় না যে, একটি ইতিবাচক নির্দেশ সমাপনের জন্য তা করা হচ্ছে। আর না শরীয়তের কোনো নেতিবাচক নির্দেশে এমন কোনো সংশোধন করা যেতে পারে যে নিষিদ্ধ কাজ কোনো ইতিবাচক নির্দেশ সমাপনের জন্য করা হচ্ছে তা মূলতই নিষিদ্ধ কার্যাবলীর সীমা বহির্ভূত গণ্য হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শরীয়ত আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছে এবং দরিদ্রদের খাদ্য দান মূলতই পুণ্যের কাজ যা শরীয়তেরও দাবী। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কি চুরি করা হালাল হয়ে যাবে? আর এই যুক্তি পেশ করা কি সঠিক হবে যে, এ কাজ মোটেই চুরি নয়, কারণ তা দরিদ্রদের অন্নদানের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে? নিসন্দেহে কোনো কোনো ইতিবাচক কাজের জন্য প্রতিটি নিষিদ্ধ কাজ নয়, বরং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজ কোনো কোনো অবস্থায় জায়েয হতে পারে। কিন্তু তার ভিত্তি এই নয় যে, ঐ নিষিদ্ধ কাজ অমুক ভালো কাজের জন্য করা হচ্ছে, বরং তা কেবল এমন অবস্থায়ই করা যেতে পারে যখন একটি ভালো কাজ সম্পাদন ঐ নিষিদ্ধ কাজের উপর নির্ভরশীল হয় এবং তার কল্যাণকারিতা সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ কাজের ধ্বংসকারিতার তুলনায় অধিক ব্যাপক এবং ঐ নিষিদ্ধ কাজে জড়িত না হলে উক্ত ভালো কাজের মহান কল্যাণকারিতা লুপ্ত হয়ে যায়।

বিশেষ কোনো প্রয়োজনে ও যথার্থ উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে এই নীতিই কার্যকর রয়েছে। শরীয়ত প্রণেতা যেখানেই কারো অনুপস্থিতিতে তাকে ভর্ৎসনা করেছেন অথবা অন্যদের তা করার অনুমতি দিয়েছেন, সেখানেই এই নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বরং উক্ত নীতিমালা শরীয়ত প্রণেতার এ ধরনেরই বক্তব্য ও কার্যাবলী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যথায় একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা গীবত হারাম করেছেন এবং তাঁর রসূল সা. স্বয়ং তার এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, কারো অনুপস্থিতিতে তার প্রকৃত দোষক্রটির বর্ণনা করা– যা তার অপছন্দনীয়–তাই গীবত।*

---

* তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৫৯ সংখ্যা।